

আল-বাকারাহ | Al-Baqara | الْبَقَرَةُ

আয়াতঃ ২ : ২৫৬

আরবি মূল আয়াত:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ
يُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى * لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

অনুবাদসমূহ:

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। — আল-বায়ান

দীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যা মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা। — তাইসিরুল

দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব যে তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। — মুজিবুর রহমান

There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has grasped the most trustworthy handhold with no break in it. And Allah is Hearing and Knowing. — Sahih International

২৫৬. দীন গ্রহণের ব্যাপারে কেন জোর-জবরদস্তি নেই(১); সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে তাগুতকে(২) অস্বীকার করবে(৩) ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙবে না(৪)। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(১) কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, দীনগ্রহণে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ দীন ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে? একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি।

যদি তাই হত, তবে জিযিয়া করার বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধ ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহর পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) “তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না”। [সূরা আল-মায়িদাহ ৬৪] এজন্য আল্লাহ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী যালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের এ কার্যপদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও যুদ্ধের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায় অনাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ-যুদ্ধের নির্দেশ ((إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ)) আয়াতের পরিপন্থী নয়। আবার কোন কোন নামধারী মুসলিম ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা “দ্বীন সম্পর্কে জোরজবরদস্তি নেই” এ অংশটুকু বলে। তারা জানে না যে, এ আয়াত দ্বারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি শুধু তাদেরকে জোর করে ইসলামে আনা যাবে না বলা হয়েছে। কিন্তু হুকুম-আহকাম মানতে বাধ্য। সেখানে শুধু জোর-যবরদস্তি নয়, উপরন্তু শরীআত না মানার শাস্তিও ইসলামে নির্ধারিত। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় আইন মানতে বাধ্য করানো অন্যান্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। যেমনটি সিদ্দীকে আকবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত প্রাদানে অস্বীকারকারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

(২) ‘তাগুত’ শব্দটি আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী বা নির্ধারিত সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় তাগুত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক ইবাদতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে ইবাদতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর ইবাদতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহ্বান করেছে। [ইবনুল কাইয়েম: ইলামুল মু'আল্লেয়ীন] সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, তাগুত এমন বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও ইলাহ হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে।

আল্লাহর মোকাবেলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা নীতিগতভাবে তার শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ‘ফাসেকী’। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফর ও শির্ক। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায়, তাকেই বলা হয় তাগুত।

এ ধরনের তাগুত অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাগুত ওলামায়ে কেরাম পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন।

(এক) শয়তান, সে হচ্ছে সকল প্রকার তাগুতের সর্দার। যেহেতু সে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে

বিরত রেখে তার ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাকে, সেহেতু সে বড় তাগুত।

(দুই) যে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে বলে দাবী করে বা অদৃশ্যের সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। যেমন, গণক, জ্যোতিষী প্রমূখ।

(তিন) যে আল্লাহর বিধানে বিচার ফয়সালা না করে মানব রচিত বিধানে বিচার-ফয়সালা করাকে আল্লাহর বিধানের সমপর্যায়ের অথবা আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে থাকে। অথবা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে বা মানুষের জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে।

(চার) যার ইবাদাত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট।

(পাঁচ) যে মানুষদেরকে নিজের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় পাঁচ প্রকার তাগুতের পরিচয় তুলে ধরা হলেও তাগুত আরও অনেক রয়েছে। [কিতাবুত তাওহীদ]

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে আমরা সকল প্রকার তাগুতের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হব। (১)

আল্লাহর রুবুবিয়্যত তথা প্রভুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করা। (২) আল্লাহর উলুহিয়াত বা আল্লাহর ইবাদাতকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করা। এ হিসেবে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য যেমন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, জীবিতকরণ, মৃত্যুদান, বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকরণ, হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন ইত্যাদিকে যে ব্যক্তি নিজের জন্য দাবী করবে সে তাগুত। অনুরূপভাবে আল্লাহকে ইবাদাত করার যত পদ্ধতি আছে যে ব্যক্তি সেগুলো তার নিজের জন্য চাইবে সেও তাগুত। এর আওতায় পড়বে ঐ সমস্ত লোকগুলো যারা নিজেদেরকে সিজদা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে। নিজেদের জন্য মানত, যবেহ, সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদির আহ্বান জানায়।

(৩) তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাগুত নেই বলে বিশ্বাস পোষণ করা। বরং তাগুতকে অস্বীকার করা বলতে বুঝায় আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত না করা এবং এ বিশ্বাস করা যে আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া সকল প্রকার ইবাদাতই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আর যারা আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে কোন কিছু তাদের জন্য দাবী করে থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এ বিশ্বাস করা যে তাদের এ ধরনের কোন ক্ষমতা নেই।

(৪) ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে জন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।

তাফসীরে জাকারিয়া

(২৫৬) ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।[1] সুতরাং যে তাগুতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

[1] এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আনসারদের কিছু যুবক ছেলেরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান

হয়ে গিয়েছিল। পরে যখন আনসাররা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তারা তাদের ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া সম্ভানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে চাইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হল। আয়াত নাযিল হওয়ার কারণের দিকে লক্ষ্য করে কোন কোন মুফাসসির এটাকে আহলে-কিতাবদের জন্য নির্দিষ্ট মনে করেন। অর্থাৎ, মুসলিম দেশে বসবাসকারী ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা যদি জিযিয়া-কর আদায় করে, তাহলে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। তবে এই আয়াতের নির্দেশ ব্যাপক। অর্থাৎ, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, মহান আল্লাহ হিদায়াত ও গুমরাহী উভয় পথই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে কুফর ও শিরকের নিষ্পত্তি এবং বাতিল শক্তি চূর্ণ করতে জিহাদ করা এক ভিন্ন ব্যাপার, এটা জোর-জবরদস্তি খেতে পৃথক জিনিস। উদ্দেশ্য সমাজ থেকে এমন শক্তি ও দাপটকে ভেঙ্গে দেওয়া, যা আল্লাহর দ্বীনের উপর আমল করার ও তার তবলীগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীন সিদ্ধান্তে ইচ্ছা হলে নিজের কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং ইচ্ছা হলে ইসলামে প্রবেশ করবে। আর যেহেতু (আল্লাহর পথে) বাধা দানকারী এই শক্তিসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ পেতেই থাকবে, তাই জিহাদের নির্দেশ এবং তার প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, “জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।” নবী করীম (সাঃ) নিজেও কাফের ও মুশরিকদের সাথে জিহাদ করেছেন এবং বলেছেন, “আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে জিহাদ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-হ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-হ’র স্বীকৃতি দেয়।” (বুখারী ২৫৭৭) অনুরূপ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ার শাস্তি (হত্যা)র সাথেও এর কোন বিরোধ নেই। (যা অনেকে মনে করে থাকে।) কেননা, মুর্তাদের শাস্তি (হত্যা)র উদ্দেশ্য জোর-জবরদস্তি নয়, বরং এর লক্ষ্য ইসলামী দেশের আইনের মর্যাদা রক্ষা। একটি ইসলামী দেশে একজন কাফেরকে তার কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুমতি অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু একবার সে যদি ইসলামে প্রবেশ করে যায়, তাহলে পুনরায় তাকে ইসলাম বিমুখ হওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। সুতরাং তাকে খুব ভেবে-চিন্তে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। কারণ, যদি এর অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে (দেশের) আইন-শৃঙ্খলার ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়বে এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিস্তার লাভ করবে। ফলে মুসলিম সমাজের নিরাপত্তার এবং দেশের আইনকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সৃষ্টি হবে বড় বিঘ্ন। তাই যেমন মানবাধিকারের নামে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার এবং ডাকাতি করা ইত্যাদি অপরাধের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না, অনুরূপ চিন্তা-স্বাধীনতা বা স্বাধীন সিদ্ধান্তের নামে কোন ইসলামী দেশে আইন ভঙ্গ করার (ইসলাম বিমুখ হওয়ার)ও অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। এটা জোর-জবরদস্তি নয়, বরং মুরতাদকে হত্যা করা ঐরূপ সুবিচার, যেমন সুবিচার হল হত্যার, লুটতরাজের এবং চারিত্রিক অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া। একটির উদ্দেশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য অন্যায় ও অনাচারের হাত হতে দেশকে বাঁচানো। আর উভয় উদ্দেশ্য একটি দেশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী দেশগুলো এই উভয় উদ্দেশ্য ত্যাগ করার কারণে যে অস্থিরতা এবং কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান